বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী
Bangladesh 50

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

# স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও এলজিইডি

# স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

# ও

# এলজিইডি

# স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও এলজিইডি

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ন'মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আজ আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করছি। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮) ছিল এর অন্যতম ভীত। এই পরিকল্পনার অন্তর্গত মূল বিষয় ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, তথা যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণ, ক্ষেতখামার ও শিল্প কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ জনপদসহ সারাদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষুধামুক্তি।

জাতির পিতার রাজনৈতিক দর্শন ছিল সুষম ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ। এ মহান নেতা উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে 'সোনার বাংলা' ধারণাটি তুলে ধরেন। এটি একটি দর্শন, যার আওতায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত। জাতির পিতার চিন্তার মূল বিষয় ছিল গ্রাম বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন। এদেশের সাধারণ জনগণের মৌলিক চাহিদা অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা ছিল মহান এ নেতার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু গ্রামের দিকে নজর দিতে বলেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন গ্রামই হচ্ছে কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল কেন্দ্র। বঙ্গবন্ধুর দেশ গঠন চিন্তার প্রথমেই ছিল খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, তথা- কৃষি উন্নয়ন। তিনি আরো বলেছিলেন, গ্রাম উন্নত হলে দেশ উন্নত হবে, কৃষককে বাঁচাতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে।

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম অনুষঙ্গ সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। এছাড়া গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে উৎপাদিত কৃষিপণ্য পরিবহণ সহজতর এবং হাটে-বাজারে বিপণন সুবিধা সৃষ্টি হবে। ফলশ্রুতিতে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। এতে একদিকে যেমন দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, পাশাপাশি কৃষকের জীবনযাত্রার মান বাড়বে।

গ্রামীণ জনপদের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সেচ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম মূলত গত শতাব্দির ৬০ এর দশকের প্রারম্ভে শুরু হয়, যার মূল ভিত্তি ছিল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা কর্তৃক উদ্ভাবিত পল্লী উন্নয়ন মডেল, যা "কুমিল্লা মডেল" নামে বিশেষভাবে পরিচিত। এই মডেলে প্রস্তাবিত ৪টি কর্মসূচি হচ্ছে-

১. পল্লীপূর্ত কর্মসূচি (আরডব্লিউপি),
২. থানা সেচ কর্মসূচি (টিআইপি),
৩. থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (টিটিডিসি), এবং
৪. দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় ব্যবস্থা (টিটিসিএ)।

এই ৪টি অঙ্গের মধ্যে পল্লীপূর্ত কর্মসূচি (আরডব্লিউপি)-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল (ক) ড্রেনেজ সুবিধা সৃষ্টিসহ গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং (খ) পল্লি অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য শ্রমঘন পদ্ধতিতে অবকাঠামো নির্মাণ কৌশল নির্ধারণ।

ষাটের দশকের শুরুতেই স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'পল্লীপূর্ত কর্মসূচি' বাস্তবায়ন শুরু হয়। পরবর্তীতে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ে 'পূর্ত কর্মসূচি সেল' ও পরে 'পূর্ত কর্মসূচি উইং' গঠন করা হয়। এরপর ১৯৮৪ সালে রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে এলজিইবি বাংলাদেশ সরকারের একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর অর্থাৎ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-এলজিইডিতে রূপান্তরিত হয়।

চিত্র-১: এলজিইডির ক্রমবিকাশ

স্বাধীনতার পর এদেশে পল্লি উন্নয়ন বলতে মূলত কৃষি উন্নয়নকে বোঝাতো। কৃষি উন্নয়নের সঙ্গে ছিল সবুজ বিপ্লব, ভূমি সংস্কার, সমবায় নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষামূলক কর্মসূচি এবং ছোটখাটো সেচ কর্মসূচি। যদিও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা শুরু হয় ১৯৬৩-১৯৬৪ সালে পল্লীপূর্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে; কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে পূর্ণাঙ্গ জাতীয় পরিকল্পনার আওতায় এই কার্যক্রম শুরু হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনা ও নেতৃত্বে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) এর অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে। এ-পরিকল্পনায় গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ হাট-বাজার উন্নয়ন এবং রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৮০-এর দশকের শুরুতে পল্লি উন্নয়নের মূল প্রভাবক হিসেবে পল্লি সড়ক উন্নয়নকে গুরুত্বের সঙ্গে উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একইসঙ্গে যে সকল গ্রামীণ হাট বাজারের ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নকেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন ১৪০৮টি গ্রামীণ হাট বাজারকে গ্রোথসেন্টার হিসেবে চিহ্নিত করে গেজেট প্রকাশিত হয়। এসব গ্রোথসেন্টার ও অন্যান্য হাটবাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্থাপিত সংযোগের ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়কগুলোকে ৪টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এগুলো হচ্ছে- ফিডার সড়ক, আর-১ সড়ক, আর-২ সড়ক ও আর-৩ সড়ক।

১৯৮৮ সালে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ফরিদপুর জেলায় সাউথওয়েস্ট রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় দুইটি সড়কের সড়কবাঁধ (এমবেঙ্কমেন্ট) এলজিইবি এর মাধ্যমে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় পাইলট হিসেবে নির্মাণে সম্মত হয়। পাইলট কাজের সাফল্যের ভিত্তিতে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি 'স্পেশাল ফুড ফর ওয়ার্কস'-এর আওতায় 'গ্রোথসেন্টার কানেক্টিং রোড' (জিসিসিআর) কর্মসূচি নিয়ে আসে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল মাটির কাজের মাধ্যমে গ্রোথসেন্টার সংযোগকারী সড়কের উন্নয়ন। এই কর্মসূচি গ্রহণের আগ পর্যন্ত জেলা পরিষদের মালিকানাধীন কিছু সংখ্যক সড়ক ব্যতীত গ্রামীণ সড়কগুলো ছিল অপ্রশস্ত, কিছু ক্ষেত্রে খুবই সরু এবং কিছু ক্ষেত্রে শুধু মাটির আইল। কোনো রকমের জমি অধিগ্রহণ ছাড়া কেবলমাত্র জনগণকে সামাজিকভাবে উদ্বুদ্ধ করে মাটির কাজ দ্বারা এসব সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা ছিল সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ। জিসিসিআর কর্মসূচির মাধ্যমে সড়কের উপরিভাগ ২৪ ফুট চওড়া করে মাটির সড়ক নির্মাণ করা হয়। ২০০৩ সাল পর্যন্ত চলমান এই কার্যক্রমে প্রায় ৩০ হাজার কিলোমিটার সড়ক এবং ১২ হাজার মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে 'গ্রোথসেন্টার কানেক্টিং রোড' কর্মসূচিই প্রথম কর্মসূচি, যার মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে দেশের সকল গ্রোথসেন্টারকে ২৪ ফুট প্রস্থের এমবেঙ্কমেন্ট দ্বারা জাতীয় মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

এদিকে ১৯৯৫ সালে কেয়ার বাংলাদেশ পিএল-৪৮০, টাইটেল-২ এর আওতায় ইউএসএআইডি কর্তৃক বরাদ্দকৃত খাদ্য সহায়তায় 'ইন্টিগ্রেটেড ফুড ফর ডেভেলপমেন্ট' প্রকল্পের কাজ শুরু করে। এর মাধ্যমে ১৯৯৫-২০০০ সময়কালে দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদকে ১৮ ফুট প্রস্থের সড়ক দ্বারা সংযুক্ত করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৬০ হাজার কিলোমিটার মাটির সড়ক নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে এলজিইডির আওতাধীন সড়কের দৈর্ঘ্য (পাকা ও কাঁচা মাটির সড়ক মিলে) সাড়ে তিন লক্ষ কিলোমিটারের ওপরে। এ বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে কোনো ধরণের জমি অধিগ্রহণ ছাড়াই জনগণের দানে। বিশ্বব্যাপী জনঅংশগ্রহণে এতো বড় সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠার নজির বোধ হয় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। মূলত এ দুটি কর্মসূচিই দেশের গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক-এর পরিকল্পিত 'ব্যাক বোন' তৈরি করেছে।

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত 'বাংলাদেশ রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্ট্র্যাটেজি ষ্টাডিতে' ইতোপূর্বে ঘোষিত ১৪০৮ টির পরিবর্তে ২১০০ টি গ্রোথসেন্টারকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। একই স্টাডিতে সড়কের শ্রেণি পুনর্বিন্যাস ও এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়। এতে সড়কগুলো সাতটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত, যার মধ্যে পল্লি এলাকার ফিডার রোড টাইপ-বি, রুরাল রোড ক্লাস-১ (আর-১), রুরাল রোড ক্লাস-২ (আর-২) এবং রুরাল রোড ক্লাস-৩ (আর-৩), এই চারটি শ্রেণির সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিলো এলজিইডির ওপর। পরবর্তীতে ২০০৩ সালে সড়কসমূহ ছয়টি শ্রেণিতে পুনর্বিন্যাস করে এর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পুনর্নির্ধারণ করা হয়। এলজিইডি উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক এবং গ্রাম সড়ক (গ্রাম সড়ক-এ ও ২ কি.মি. পর্যন্ত গ্রাম সড়ক-বি) এর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং এসব সড়কের ওপর ১৫০০ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘের সেতু নির্মাণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতির পিতা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের যে রূপরেখা দিয়েছিলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আজ তা অনেকাংশে অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নে উন্নয়নশীল বিশ্বের রোল মডেল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আগ্রহে পল্লি অবকাঠামোয় বিনিয়োগ অনেক বেড়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এসডিজি'র টার্গেট ৯.১-এর একটি সূচক হলো 'সব মৌসুমে চলাচলের উপযোগী সড়কের দুই কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত'। দেশের কিছু হাওড়, দ্বীপাঞ্চল এবং দুর্গম পাহাড়ি জনপদ ছাড়া প্রায় সব উপজেলায় এ সূচকের মান শতভাগ। বিশ্বব্যাংকের গবেষণায় দেখা গেছে, দেশব্যাপী এ সূচকের গড় মান প্রায় ৮৮ শতাংশ, যা উন্নয়নশীল অধিকাংশ দেশের চেয়ে বেশি। আশা করা যায়, এ সূচকে বাংলাদেশ সহজেই এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে।

গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে প্রান্তিক নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, যা দেশে দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এসব সড়ক উন্নয়নের ফলে শিক্ষার হার বৃদ্ধিসহ ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার কমেছে। স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের প্রবেশগম্যতা বেড়েছে। গ্রোথসেন্টার উন্নয়নের ফলে কৃষি ও অকৃষি পণ্যের বাজারজাত করা সহজতর হয়েছে এবং পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে, বেড়েছে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম। এসব কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও মাথাপিছু আয় বেড়েছে, ফলে জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে।

এলজিইডি স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র হ্রাসসহ পল্লি ও নগর উন্নয়নের শক্তিশালী ভিত নির্মাণ করছে, যা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে। স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডির ভূমিকা আজ বিশ্ব স্বীকৃত। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি এলজিইডি ১৯৮৫ সাল থেকে নগর এবং ১৯৯৫ সাল থেকে পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এলজিইডির এই কার্যক্রম শহরাঞ্চলে নাগরিক সুবিধা যেমন বৃদ্ধি করছে, পাশাপাশি দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

# গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন

গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো তথা- গ্রামীণ সড়ক ও সেতু/কালভার্ট এবং গ্রোথসেন্টার ও গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে এলজিইডির কার্যক্রম শুরু হলেও সময়ের বিবর্তনে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্থানীয় পর্যায়ের অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডিকে সম্পৃক্ত করা হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, দুর্যোগকালে মানুষের জানমালের নিরাপত্তার জন্য বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ, পরিবেশ সুরক্ষায় সড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ, সড়ক ও নৌপরিবহণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য ল্যান্ডিংঘাট নির্মাণ, সামাজিক অবকাঠামো, যেমন- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, কবরস্থান, শ্মশানঘাট ইত্যাদির উন্নয়ন ।

## 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ

দেশের প্রায় ৬৫ শতাংশ জনগণ গ্রামে বাস করে। গ্রামে নাগরিক সুবিধা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকায় উন্নত জীবনের আশায় মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। ফলে শহরগুলোর ওপর বাড়তি চাপ পড়ছে। দেশজুড়ে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গ্রামে নাগরিক-সুবিধা সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। গ্রামে শহরের সকল নাগরিক সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বর্তমান সরকার 'আমার গ্রাম-আমার শহর": প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ শীর্ষক নির্বাচনী অঙ্গীকার ঘোষণা করে।

সরকারের ২০ টি মন্ত্রণালয়ের ২৬ টি সংস্থা 'আমার গ্রাম-আমার শহর' কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ সকল মন্ত্রণালয় 'আমার গ্রাম-আমার শহর' কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২৪৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

২০২০ সালে স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে আটটি বিষয় রয়েছে। বিষয়সমূহ হলো- গ্রামীণ যোগাযোগ, গ্রামীণ গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার, গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কম্যুনিটি স্পেস ও বিনোদন ব্যবস্থা, উপজেলা মাস্টার প্ল্যান, গ্রামীণ গৃহায়ন এবং উপজেলা পরিষদ-ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদিত এ কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত আটটি বিষয়ে দেশব্যাপী পরিকল্পিতভাবে 'আমার গ্রাম-আমার শহর'অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ৩০ টি গাইডলাইন/ নীতিমালা তৈরি এবং ৩৬টি সমীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি রূপকল্প ২০৪১ সামনে রেখে দেশের গ্রামগুলোকে পরিকল্পিত ভাবে গড়ে তোলার জন্য ১৫টি পাইলট গ্রাম উন্নয়নের একটি প্রকল্প তৈরি করা হচ্ছে।

## অর্জিত সাফল্য

জন্মলগ্ন থেকে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পর্যন্ত এলজিইডির গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে অর্জিত সাফল্য

| | |
|---|---|
| সড়ক উন্নয়ন মোট | ৩,৫৩,৩৫২ কি.মি. |
| পাকা | ১,৩১,৮৫১ কি.মি. |
| কাঁচা | ২,২১,৫০১ কি.মি. |
| সেতু/ কালভার্ট নির্মাণ | ১৩,৬৭,৮৭০ মিটার |
| গ্রোথসেন্টার উন্নয়ন | ২,০৮৪ টি |
| গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন | ২,৫৮০ টি |
| ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ | ৩,৪১৬ টি |
| উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স মোট | ৩৫২ টি |
| নির্মাণ | ৩২০ টি |
| সম্প্রসারণ | ৩২ টি |
| সাইক্লোন শেল্টার | ১৭১০ টি |
| সড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ | ২৫,৬৭৫ কি.মি. |
| সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন | ১১,৮৪৬ টি |

## সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

দেশে বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৫৩ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক আছে, যার মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৩২ হাজার কিলোমিটার পাকা সড়ক। গ্রামীণ সড়কের ওপর মোট ১৩,৬৮,৮৭০মিটার সেতু/কালভার্ট রয়েছে। এছাড়া প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এলজিইডি'র বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সাড়ে চার থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটার সড়ক ও ১২ হাজার মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব সড়ক গ্রোথসেন্টার ও হাট-বাজার এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন অঞ্চলে জনগণের যাতায়াত সুগম করেছে, যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সুবিধা, খামার পর্যায়ে কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রশাসনিক সেবা পল্লির মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে অসামান্য অবদান রাখছে।

দেশের বিশাল এ পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক জাতীয় সম্পদ। এসব সড়কের সুরক্ষা এবং বছরব্যাপী যানবাহন চলাচল উপযোগী রাখার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত ১৯৯২-৯৩ অর্থবছর থেকে সরকারের রাজস্ব বাজেট এবং পরবর্তীতে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান হারে অর্থ বরাদ্দ সত্ত্বেও এ খাতে আর্থিক সংকট বিরাজ করছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ সড়কে যানবাহনের পরিমাণ বৃদ্ধি, অতিরিক্ত মালবোঝাই যান চলাচল এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে সড়কের ক্ষতিসাধন।

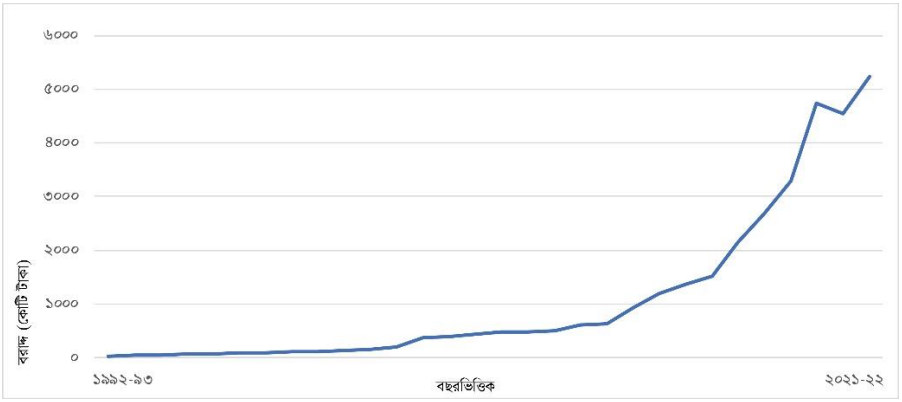


চিত্র-২: ১৯৯২-১৯৯৩ অর্থবছর থেকে বছরভিত্তিক প্রাপ্ত বরাদ্দ

প্রতি অর্থবছরে এলজিইডির সড়ক নেটওয়ার্কের রক্ষণাবেক্ষণের চাহিদা নিরূপণ, সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, অগ্রাধিকার নির্ণয় ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে নিবিড় তদারকি ও মনিটরিং এবং বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ অনুশীলন সফলভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে এলজিইডি'র বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ফলে গুণগতমান সম্পন্ন রক্ষণাবেক্ষণসহ প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ অর্থের শতভাগ ব্যয় করা সম্ভবপর হচ্ছে। ভবিষ্যতে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পূর্ণ অনলাইনভিত্তিক করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

# নগর উন্নয়ন সেক্টর

আজ থেকে ৫০ বছর আগে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৯১ শতাংশ (বিবিএস: ১৯৭৪) গ্রামে বাস করতো। সময়ের সাথে সাথে শহরমুখী মানুষের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতে বন্যা, অতিবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, খরা প্রভৃতি কারণে ফসলহানী, অব্যাহত নদী ভাঙন এবং গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা নিম্নআয়ের মানুষকে শহরমুখী করছে। একই সঙ্গে সামর্থ্যবান মানুষ উন্নত জীবনের প্রত্যাশায়ও শহরমুখী হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের শহরগুলোতে জনসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আমাদের শহরগুলো পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠেনি। রাস্তার অপ্রতুলতা, অপর্যাপ্ত পয়ঃ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, যথাযথ সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার অভাব এদেশের পৌরসভাগুলোকে নাগরিক সেবা প্রদানে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। সেই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে।

এই বাস্তবতায় ইউনিসেফ এর আর্থিক সহায়তায় এলজিইডি ১৯৮৫ সালে বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নগর এলাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। অতঃপর দেশের মাঝারি শহরগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সেকেন্ডারি টাউন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসটিআইডিপি) শীর্ষক প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালে এসটিআইডিপি-২ বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে আরও ব্যাপকভাবে নগর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমএসপি) শিরোনামে একটি প্রকল্প ২০০০ সালে বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডিতে 'মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট' (এমএসইউ) গঠন করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদমর্যাদার একজন পরিচালকের তত্ত্বাবধানে এমএসইউ এর কার্যক্রম ৬টি রিজিওনাল মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট (আরএমএসইউ) এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যার আওতায় এমএসপিভুক্ত ১৭টি সহ মোট ১৫০টি পৌরসভায় দক্ষতা উন্নয়ন সহযোগিতা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট প্রথম নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের (ইউজিআইআইপি) আওতায় 'আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট' (ইউএমএসইউ) গঠন করা হয় এবং একই কার্যক্রম আরও ৪টি রিজিওয়নে সম্প্রসারণ করা হয়। ২০০২ সালে সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় এলজিইডির পূর্ণাঙ্গ নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। পৌরসভার 'ন্যাশনাল ডাটাবেজ' হালনাগাদ কাজে এই ইউনিট সহায়তা প্রদান করে।

বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় সারাদেশে এলজিইডির একাধিক নগর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব প্রকল্পের আওতায় নগরবাসীর নাগরিক পরিসেবার মান বাড়াতে বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে।

নগর এলাকায় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডির কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে –

- সড়ক, ড্রেন ও ফুটপাত নির্মাণ এবং সড়কবাতি স্থাপন
- কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন
- পাবলিক টয়লেট ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ
- বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ
- পৌর মার্কেট ও কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন
- বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন
- লেক উন্নয়ন এবং উন্মুক্ত উদ্যান নির্মাণ।

পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করলেও টেকসই উন্নয়নের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিচালন ব্যবস্থার মান বৃদ্ধিতে এলজিইডি পৌরসভাসমূহকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। পৌরসভার পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নেও এলজিইডি কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। এলজিইডির সার্বিক কার্যক্রমের ফলে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের পরিচালন ব্যবস্থা ও নাগরিক সেবার মান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, পরিচালন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং নাগরিক সেবার মান উন্নয়নে এলজিইডি গৃহীত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম:

**মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন:**

পরিকল্পিত নগর উন্নয়নের জন্য এলজিইডি দেশের বিভিন্ন পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নে কারিগরি সহয়তা প্রদান করে থাকে। নগরবাসীর সরাসরি অংশগ্রহণে একাধিক প্রকল্পের আওতায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের ফলে পৌরসভার পরিকল্পিত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সহজতর হয়েছে।

**নগর পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন:**

এলজিইডি পৌরসভাসমূহের পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা (ইউজিআইএপি) বাস্তবায়ন করছে। এলজিইডির আওতাধীন প্রথম নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি), দ্বিতীয় ও তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-২ ও ইউজিআইআইপি-৩) নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (নবিদেপ), উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সিটিইআইপি) এর আওতায় সর্বমোট ৯৭টি পৌরসভায় ইউজিএআইপি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সিটি গভর্নেন্স প্রজেক্ট (সিজিপি) এর মাধ্যমে ৫টি সিটি কর্পোরেশনের পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য এই ইনক্লুসিভ সিটি গভর্নেন্স ইম্প্রুভমেন্ট অ্যাকশন প্রোগ্রাম (আইসিজিআইএপি) কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

**দক্ষতা উন্নয়ন:**

পৌরসভায় কর্মরত জনবলসহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এলজিইডির আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়, যার মধ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং হোল্ডিং ট্যাক্স, অ্যাকাউন্টিং, ট্রেড লাইসেন্স ও ওয়াটার বিলিং সফটওয়্যার স্থাপন ও পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পৌরসভার আর্থিক ও হিসাব ব্যবস্থাপনা, নাগরিক অংশগ্রহণ, মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অন্যতম।

## অর্জিত সাফল্য

| | | |
|---|---|---|
| সড়ক/ফুটপাত নির্মাণ | | ৮,৩৭৬ কিলোমিটার |
| ড্রেন নির্মাণ | | ৩,৯৩১ কিলোমিটার |
| ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ | | ১৩,২৪১ মিটার |
| সড়ক মেরামত | | ৪,০৪৯ কিলোমিটার |
| বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ | | ৪১ টি |
| ল্যাট্রিন/কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ | | ৫৭,১৩২ টি |
| কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ | | ৫৩ টি |
| বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট | | ৫টি |
| ডাস্টবিন নির্মাণ | | ২৬৯ টি |
| মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ণ | মোট | ২৫৭টি |
| | পৌরসভা | ২৫৫টি |
| | সিটি কর্পোরেশন | ২টি |
| নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন | | |
| | পৌরসভা | ৯৭টি |
| | সিটি কর্পোরেশন | ৫টি |

বর্তমানে নগর জনগোষ্ঠী দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ হলেও জাতীয় উৎপাদনে নগর ও শহরের অবদান শতকরা ৬০ ভাগের বেশি, যা পল্লি অঞ্চলের তুলনায় নগর অঞ্চলের অধিক উৎপাদনশীলতার নির্দেশক। দ্রুত বেড়ে ওঠা নগরগুলো উৎপাদনশীলতার বিবেচনায় অপার সম্ভাবনার উৎস। সে কারণে নগরে বসবাসরত নাগরিকদের আবাসন, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও বস্তি এলাকার উন্নয়নসহ নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নের মধ্য দিয়ে পরিকল্পিত ও টেকসই নগর গড়ার লক্ষ্যে এলজিইডি কাজ করছে।

# পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর

দেশের কৃষি উৎপাদনে সেচ একটি বড় অনুষঙ্গ। এক্ষেত্রে নদী বা খালের পানি তথা ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ প্রদান একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে, অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার সীমিত করে পরিবেশ সুরক্ষা করা যায়।

কুমিল্লা মডেলের প্রস্তাবিত থানা সেচ কর্মসূচি (টিআইপি) এর প্রাথমিক কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের মাধ্যমে হয়ে থাকলেও পরবর্তীতে এলজিইডি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-আইডিপি) এর আওতায় ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কুড়িগ্রাম ও বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় ৬০টি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করে।

গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়নে থানা সেচ কর্মসূচির সুফল অনুধাবন ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তীতে ১৯৯৫-২০০২ মেয়াদে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। প্রকল্প চলাকালীন ১৯৯৯ সালে সরকার জাতীয় পানি নীতি অনুমোদন করে। পানি নীতির আলোকে এলজিইডি এক হাজার হেক্টর পর্যন্ত কমান্ড এলাকার সমন্বিত বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। অংশগ্রহণমূলক এসব প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্প নির্বাচন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে এর বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উপকারভোগী সবাই অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাঁদের নিয়েই গঠিত হয় পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)।

এলজিইডি পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় যেসব উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে তা মূলত চার ধরণের-

| উপ-প্রকল্পের ধরণ | অবকাঠামো |
|---|---|
| বন্যা ব্যবস্থাপনা | বাঁধ নির্মাণ, সংস্কার বা পুনর্বাসন, রেগুলেটর বা স্লুইস ও কালভার্ট নির্মাণ, খাল খনন বা পুনর্খনন |
| পানি-নিষ্কাশন | কালভার্ট নির্মাণ, খাল খনন বা পুনর্খনন |
| পানি সংরক্ষণ | পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো, রাবার ড্যাম, খাল পুনর্খনন ও স্পিলওয়ে |
| কমান্ড এলাকা উন্নয়ন | সেচ নালা সংস্কার, ভূ-উপরিস্থ বা ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা, হেডার ট্যাংক, একুইডাক্ট ও সাইফুন |

১৯৯৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত এই সেক্টরে সাতটি  প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষ হয়েছে এবং দুটি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শেষ হয়ে যাওয়া সাতটি প্রকল্পের আওতায় ১১২৮টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে ১১২০ টি উপ-প্রকল্প স্থানীয় উপকারভোগীদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। দুটি চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৫ টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ৩৯৫ টি বিদ্যমান উপ-প্রকল্পের সম্প্রসারণ/পুনর্বাসন/কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীগণ সঠিক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন, সমন্বিত কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে একদিকে যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন, অন্যদিকে দেশকে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনে অবদান রাখছেন। কৃষি বিশেষ করে ধান, সবজি ও মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ওপরের সারিতে। এই অর্জনে এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

উপ-প্রকল্প

| | |
|---|---|
| বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পের সংখ্যা | ১,১২৮ টি |
| হস্তান্তরিত উপ- প্রকল্পের সংখ্যা | ১,১২০ টি |
| মোট উপকৃত এলাকা | ৬,৮০,৫৭৭ হেক্টর কি.মি |

বার্ষিক উৎপাদন

| | |
|---|---|
| দানাদার শস্য | ৮,৬০,৫৩৫ মেট্রিক টন |
| অদানাদার শস্য | ৪,৭৭,১২১ মেট্রিক টন |
| মৎস্য | ৫,৯১৯ মেট্রিক টন |

অবকাঠামো

| | |
|---|---|
| স্লুইচ/রেগুলেটর নির্মাণ | ২২৭০ টি |
| বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ | ২০০৭ কি.মি. |
| খাল খনন/পুনর্খনন | ৬৯৭১ কি.মি |
| ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপন | ৪২৫ কি.মি. |
| রাবার ড্যাম নির্মাণ | ৫২ টি |
| সমিতির অফিস ঘর নির্মাণ | ৮২৩ টি |

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি

| | |
|---|---|
| মোট সমিতির সংখ্যা | ১২০০ টি |
| মোট উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা | ৫,১৫,৫৮৯ টি |
| সমিতির সদস্য সংখ্যা | |
| মোট | ৪,৫৭,২৫০ জন |
| পুরুষ | ৩,১১,৯৭৯ জন |
| নারী | ১,৪৫,২৭১ জন |

বাস্তবায়ন পরবর্তী প্রভাব

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক ‘বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প’ এলাকায় বাস্তবায়ন পরবর্তী প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়। এতে দেখা যায়

| | |
|---|---|
| শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি | ১৩৭% থেকে ২১০% |
| মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি (খানা প্রতি) | ৭.০৩ থেকে ২৪.০৭ কেজি |
| কর্মসংস্থান বৃদ্ধি | ৫৩% |
| দারিদ্র্যসীমার ওপর বসবাস | ৭৭%. |
| কাঁচা বাড়ির সংখ্যা হ্রাস | ৪৬.৪% থেকে ৬.৯% |
| পাকা বাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি | ১.২% থেকে ৬% |

শস্য ও মৎস্য উৎপাদনের এই বৃদ্ধি খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং প্রকল্প এলাকায় জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন এসেছে ।

# এলজিইডির বিশেষ কার্যক্রম

বৈচিত্র্যপূর্ণ বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিতে রয়েছে সমতলভূমি, পাহাড়, বরেন্দ্রভূমি, বিস্তীর্ণ হাওর এবং বঙ্গোপসাগরের কোলঘেঁষে উপকূলীয় অঞ্চল। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অঞ্চলভিত্তিক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের বিশেষ দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে এলজিইডি বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

## বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য কার্যক্রম

বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিক রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম সহজ করা ও স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সরকার। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ‘জরুরিভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টিসেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি)’ এবং এডিবির সহায়তায় ‘বাংলাদেশ: জরুরি সহায়তা প্রকল্প’। এলজিইডি অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে প্রকল্প দুটি বাস্তবায়ন করছে।

**পার্বত্য অঞ্চল**

চট্রগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার আয়তন ১৩ হাজার বর্গকিলোমিটারের কিছু বেশি, যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় এক-দশমাংশ। বৈচিত্রপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের এ এলাকার শতকরা প্রায় ৭৮ ভাগ অধিবাসীই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর। এ অঞ্চলে দারিদ্র্যের হার দেশের জাতীয় গড় দারিদ্র্যের হারের চেয়ে বেশি। অতিবৃষ্টির ফলে সৃষ্ট পাহাড়ি ঢল, ভূমিধ্বসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে এসব দুর্গম জনপদে কর্মসংস্থান আয় বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ অনেক সীমিত। এছাড়াও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে লোকালয়গুলো অনেক পিছিয়ে আছে। এই প্রেক্ষাপটে এলজিইডি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার মোট ২৬টি উপজেলায় নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি হবে। ফলে যাতায়াতে সময় ও খরচ কমবে। উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সহজ হবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এলাকায় শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে। আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত দুর্গম এই অঞ্চলের জনগণের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতায়াত সহজতর হবে। পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দ্রুত চলাচল সুবিধা নিশ্চিত হওয়ায় এলাকায় অপরাধ প্রবণতা কমে আসবে। একই সঙ্গে এই জনপদের অধিবাসীদের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আনবে।

## হাওর অঞ্চল

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে রয়েছে ছোট বড় অনেক হাওর। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে হাওর অঞ্চলের প্রায় ৮,৬০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা প্লাবিত হয়। বছরের প্রায় সাত মাস এসব এলাকা জলমগ্ন থাকে। হাওর এলাকায় বিপুল পরিমাণ বোরো ধান উৎপন্ন হয়। প্রায়শই আগাম বন্যায় ঘরে তোলার আগেই ফসল পানিতে তলিয়ে যায়। এতে স্থানীয় কৃষকদের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি জীবনযাপন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দৈনন্দিন কর্মকান্ড ব্যাহত হয়।

হাওরে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য। কৃষি বিশেষ করে ধান ও মৎস্য সম্পদের একটি বড় অংশের যোগান আসে এই হাওর থেকে। প্রকৃতিগত কারণে হাওর অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রম সাধারণ এলাকার থেকে আলাদা। অবকাঠামো উন্নয়নে এখানে রয়েছে নানা রকম চ্যালেঞ্জ। নানারকম প্রতিকূলতার মধ্যেও হাওর এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকা ও জীবনমান উন্নয়নে এলজিইডি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। এসবের মধ্যে রয়েছে ডুবো সড়ক, সেতু/কালভার্ট, গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়ন ও মার্কেট কালেকশন সেন্টার, বোট ল্যান্ডি ঘাট, সেচ অবকাঠামো, মাটির কিল্লারসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ। এছাড়াও গ্রাম, বাজার ও রাস্তার পাড় বা ঢাল প্রতিরক্ষা, সড়ক অবকাঠামো মেরামত, মৎস্য চাষ, বিলে মৎস্য অভয়াশ্রম ও জলজবৃক্ষ রোপন, বিকল্প আয়বৃদ্ধিমূলক নানান প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

## ছিটমহলবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল ভারতের অভ্যন্তরে এবং ভারতের ১১১টি ছিটমহল বাংলাদেশে থেকে যায়। ২০১৫ সালে ৩১ জুলাই ছিটমহল বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহলগুলো বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত এবং ভারতের অন্তর্গত বাংলাদেশের ছিটমহলগুলো ভারতীয় সীমানাভুক্ত হয়। দীর্ঘ ৪৪ বছর ছিটমহলের অধিবাসীরা বিভিন্ন নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত ছিল। ছিটমহলবাসীর নাগরিক সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিটমহলের অবকাঠামোসমূহ উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে এলজিইডি ছিটমহলভুক্ত পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী জেলায় প্রকল্প গ্রহণ করে।

প্রকল্পের আওতায় সড়ক উন্নয়ন, সেতু নির্মাণ, গ্রোথ সেন্টার/মার্কেট, মসজিদ, কমিউনিটি সেন্টার, মন্দির, ঘাটলা ও শ্মশান ঘাট নির্মাণ এবং কবরস্থান উন্নয়ন করা হয়েছে। সুবিধাবঞ্চিত ছিটমহলবাসীর সরাসরি অংশগ্রহণে এসব অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যা তাদের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

বিলুপ্ত ছিটমহলের নবনির্মিত ইয়ারপাড়া সড়কে ১.৫০ মিটার দীর্ঘ কালভার্ট, বোদা, পঞ্চগড়

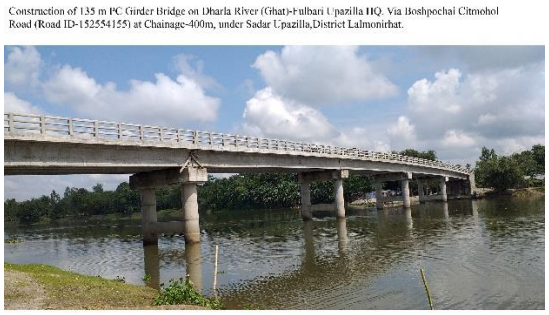
Construction of 135 m PC Girder Bridge on Dharla River (Ghat)-Fulbari Upazilla HQ. Via Boshpochai Citmohol Road (Road ID-152554155) at Chainage-400m, under Sadar Upazilla,District Lalmonirhat.

বিলুপ্ত ছিটমহলের নবনির্মিত মার্কেট, পঞ্চগড় সদর

বিলুপ্ত ছিটমহলের নবনির্মিত কালিরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফুলবাড়ি, কুড়িগ্রাম

## বরেন্দ্র অঞ্চল

বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং তুলনামূলক কম বৃষ্টিপাতের কারণে প্রতিবছর পানির স্তর নিচে নেমে যেতে থাকে। এ বাস্তবতায় এলজিইডি বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে পাইপের মাধ্যমে উৎস থেকে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে বরেন্দ্র এলাকার তিনটি জেলা রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ এবং সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, জয়পুরহাট ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন উপজেলায় খাল খনন, কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট (ক্যাড), ফ্ল্যাড কন্ট্রোল ড্রেনেজ (এফসিডি) ব্যবস্থা উন্নয়নে কাজ করছে।

# বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন

সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অনন্য সাফল্য অর্জন করায় এলজিইডি নিজস্ব মন্ত্রণালয় ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ফলে সেসব মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের আওতাধীন প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডিকে দায়িত্ব প্রদান করছে।

**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নই দেখেননি, তিনি একটি উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধ, 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলতেন,সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। অর্থাৎ দক্ষ, যোগ্য, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক, আধুনিক, শিক্ষিত মানবসম্পদ। আর তা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সত্যিকার মানুষ গড়ার শিক্ষা বা সুশিক্ষা।

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে এলজিইডি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবৎ নিবিড়ভাবে কাজ করে আসছে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন কর্মসূচির চতুর্থ পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে। দেশব্যাপী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি পিটিআই অবকাঠামো সম্প্রসারণ, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রয়োজনভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণের আওতায় চর, দ্বীপাঞ্চল, হাওর, চা-বাগানসহ দুর্গম ও শিক্ষায় অনগ্রসর এলাকাসহ সারাদেশে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

## মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে সবচেয়ে সম্মানজনক ও আবেগপূর্ণ একটি বিষয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদ ও দু'লক্ষ নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয় আমাদের মহান বিজয়।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং এর সঠিক ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তুলে ধরার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প' হাতে নিয়েছে। এলজিইডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় দেশের সবগুলো জেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত ৩৬০টি ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ করা হবে। নির্মিত অবকাঠামোর সঙ্গে ওই স্থানের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকবে।

আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক আর একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এলজিইডি। পাঁচতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের তিনতলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হচ্ছে। ভবনের নিচতলা এবং দ্বিতীয়তলায় বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য দোকান, তৃতীয়তলায় হল রুম, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিস এবং লাইব্রেরি কাম মিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থাকবে। দোকান, হল রুম ও ছাদ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভাড়া দেওয়া হবে, যা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিজস্ব আয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

ভূমিহীন ও অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধারা উপার্জনক্ষম না হওয়ায় তাঁদের পক্ষে নিজস্ব বাসস্থান নির্মাণ বেশ দুরূহ। জাতির এ শ্রেষ্ঠ সন্তানদের কথা বিবেচনা করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১২ সালে 'ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ' প্রকল্পটি গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের সকল উপজেলায় বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পানি, বিদ্যুৎ, স্যানিটেশন ও টয়লেট সুবিধাসহ মোট ৫০০ বর্গফুট আয়তনের 'বীর নিবাস' নামে ২,৯৭১টি বাসস্থান নির্মাণ করা হয়।

**অন্যান্য মন্ত্রণালয়**

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় এলজিইডি যেসব প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করছে তা হচ্ছে-

- গাজীপুরে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক উন্নয়ন;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ইউনিয়ন কৃষক সেবাকেন্দ্র নির্মাণ;
- ভূমি মন্ত্রণালয়ের শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন তিন পার্বত্য জেলায় উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক এবং সেতু নির্মাণ।

# জেন্ডার উন্নয়ন ও এলজিইডি

**জেন্ডার সমতা - জেন্ডার উন্নয়নে এলজিইডি**

গ্রামীণ দুস্থ নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে ১৯৮৫ সালে ফরিদপুরে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে মাটির কাজে পুরুষের পাশাপাশি দুস্থ নারীদের সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে শুরু হয় জেন্ডার উন্নয়নে এলজিইডির কার্যক্রম। একই সময়ে নগর এলাকায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প এবং পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পেও নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পর্যায়ক্রমে নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা অর্জনে উন্নয়ন কাজে নারীদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো হয়।

এলজিইডির প্রাতিষ্ঠানিক ও উন্নয়ন কার্যক্রমে জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ অনুসরণে প্রণয়ন করা হয়েছে জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, যা প্রতি পাঁচ বছর পর পর হালনাগাদ করা হয়।

নারী উন্নয়নে এলজিইডির কার্যক্রম প্রান্তিক নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে শক্ত ভিত রচনা করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলো হলো- নির্মাণশ্রমিক হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি; গ্রামীণ হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, পৌরসভার নগর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি), ওয়ার্ড কমিটি এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)-তে নারীর পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টিতে অবদান রাখা; নারীকেন্দ্রিক সংগঠন পরিচালনা; গ্রামীণ হাটবাজারে নারীদের জন্য দোকান বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সহায়ক পরিবেশ তৈরি।

শ্রমিক হিসেবে পাওয়া মজুরি এবং এলসিএস সদস্য হিসেবে কাজের লভ্যাংশ থেকে পাওয়া অর্থ নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষভাবে সহায়তা করছে। তাঁরা উদ্যোগী হয়ে গবাদীপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, শাকসবজি চাষ, দর্জির কাজসহ নানা ধরনের আয়বর্ধক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। অনেকে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকে চাষাবাদের জন্য জমি কিনেছেন, বাড়িঘর বানিয়েছেন। অসহায় ও দুস্থ নারীদের সম্পদে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারা মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন, নিশ্চিত হয়েছে বিশুদ্ধ খাবার পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, পেয়েছেন বিদ্যুৎ ও বিনোদন সুবিধা।

এলজিইডির জীবনমান উন্নয়নভিত্তিক প্রশিক্ষণ নারীদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ ও নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলি বিকশিত করেছে। এসব নারীরা স্থানীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, দুর্যোগ প্রতিরোধ কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করছেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে অনেকে নির্বাচিত হয়েছেন। বেড়েছে সামাজিক মর্যাদা। নারী নির্যাতন ও বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ ও শিশু জন্মনিবন্ধনে রাখছেন বিশেষ ভূমিকা। এসকল আত্মনির্ভরশীল নারীরা অন্য সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করছেন।

## শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা

প্রতিবছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সাবলম্বী হওয়া শ্রেষ্ঠ নারীদের সম্মাননা প্রদান করে আসছে। ২০১০ সাল থেকে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বছর ২০২১ পর্যন্ত গত ১২ বছরে পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে সর্বমোট ১১৬ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। এলজিইডি সদর দপ্তরে আয়োজিত আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মাননাপ্রাপ্ত নারীদের নগদ অর্থ, সম্মাননা স্মারক ও সনদ প্রদান করা হয়।

## দিবাযত্ন কেন্দ্র

শিশুকে কাছাকাছি রেখে কোনো রকম মানসিক উদ্বেগ ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ তৈরি, শিশুদের মাতৃদুগ্ধপানের অধিকার সুরক্ষা ও মাতৃ-সাহচর্যের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তার লক্ষ্যে ২০০৭ সালে এলজিইডি সদর দপ্তরে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এলজিইডিতে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের অফিস সময়ে নিরাপদে রাখার উদ্দেশ্যে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এই শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রটি পরিচালনা করা হচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে ১০ সদস্যের একটি কমিটি দিবাযত্ন কেন্দ্রটি পরিচালনা করে। শিশুদের সার্বক্ষণিক পরিচর্যার জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্রে একজন সুপারভাইজার, দুইজন সহকারী সুপারভাইজার এবং পাঁচজন কেয়ারগিভার রয়েছেন। দিবাযত্ন কেন্দ্রের পরিসেবার বিষয়ে অভিভাবকগণের সঙ্গে পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব নিয়মিত মতবিনিময় করে থাকেন। সুশৃংখল ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার জন্য একটি অপারেশনাল ম্যানুয়াল অনুসরণ করা হয়।

# ডিজিটাল সার্ভিসেস

১৯৮৫ সালে প্রথম দুটি আইবিএম মাইক্রো কম্পিউটার সংযুক্তির মাধ্যমে তৎকালীন এলজিইবিতে কম্পিউটার ব্যবহার শুরু হয়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আওতায় বিশেষ কাজের বিনিময়ে খাদ্য -এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত গ্রোথসেন্টার সংযোগকারী সড়কে মাটির কাজের তথ্য সংরক্ষণ ও কার্যক্রম মনিটরিং- এ এই কম্পিউটার ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে জিআইএস প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করার মধ্য দিয়ে তা বিস্তার লাভ করে।

৯০ -এর দশকের মাঝামাঝি প্রথমে চট্টগ্রাম ও কুষ্টিয়া জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে এবং পরবর্তীতে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় পর্যায়ক্রমে এলজিইডির দাপ্তরিক কার্যক্রমে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয়। ফাইবার অপটিক ব্যাকবোন সহকারে ল্যান নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয় ১৯৯৬ সালে। বর্তমানে এলজিইডি সদর দপ্তর ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় নিজস্ব লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে সংযুক্ত আছে। দেশের সকল জেলা কার্যালয়কে শীঘ্রই ল্যানের মাধ্যমে সদর দপ্তরের সঙ্গে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে করে তথ্য আদান-প্রদান আরো নিরাপদ, সহজ ও দ্রুততর হবে।

গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজকে নির্ভুল, যুগোপযোগী ও সহজতর করার লক্ষ্যে এলজিইডি সরকারি সংস্থা হিসেবে দেশের মধ্যে প্রথম জিআইএস প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করে। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা টপোগ্রাফিক সার্ভে ম্যাপ, থানা ম্যাপ, স্যাটেলাইট ইমেজ এবং নিজস্ব জিপিএস সার্ভে করার পর বিভিন্ন ধাপে এলজিইডি সমগ্র দেশের ডিজিটাল ম্যাপ তৈরি করে, যা ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এলজিইডি ওয়েবসাইটে জনসাধারণের জন্য বিনামূল্যে প্রাপ্তির জন্য উন্মুক্ত করেন।

জনগণকে সহজে জিআইএস প্রযুক্তির সুবিধা প্রদানের জন্য এলজিইডি নিজস্ব জিআইএস পোর্টাল তৈরি করেছে। এর মাধ্যমে যে কোনো স্থান থেকে অনলাইনে সহজেই এলজিইডিতে সংরক্ষিত জিআইএস ডাটা ব্যবহার করে প্রয়োজন মাফিক ম্যাপ তৈরি করা যায়।

সরকারি সেবা সহজলভ্য ও দাপ্তরিক কার্যক্রমকে গতিশীল, নির্ভুল ও সহজতর করার জন্য এলজিইডি সবসময় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। এর অংশ হিসেবে নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকে এলজিইডি নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.lged.gov.bd) ব্যবহার শুরু করে। এই ওয়েবসাইটে এলজিইডি'র সকল কার্যালয়ের (ইউনিট, প্রকল্প, বিভাগ, অঞ্চল ও উপজেলা) জন্য আলাদা পেইজ রয়েছে, যাতে করে জনগণ সহজে তাঁর চাহিদা মোতাবেক তথ্য খুঁজে পায়। উল্লেখ্য যে, ২০১৫ সালে নির্মিত বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় তথ্য বাতায়নের সাথে এলজিইডি সংযুক্ত রয়েছে। এছাড়া এলজিইডি দাপ্তরিক কাজের সুবিধার জন্য বিভিন্ন কাস্টমাইজড সফ্টওয়্যার তৈরি ও ব্যবহার করে আসছে, এর মধ্যে অন্যতম পারসোনাল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (পিএমআইএস)। এতে এলজিইডির সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তথ্য (ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক) সংরক্ষিত রয়েছে এবং সকল বদলি ও পদায়নের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

দেশের গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে এলজিইডি মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ কিলোমিটারের এই সড়ক ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য এলজিইডি নিজস্ব রোড ডাটাবেজ ব্যবহার করে, যেখানে প্রতিটি সড়কের ইউনিক আইডি এবং সড়কের সকল তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে। এলজিইডি'র উন্নয়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজে এই ডাটাবেজ ব্যাপকভাবে সহায়তা করে।

যেকোন ধরনের পূর্ত কাজ বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজটির একটি দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হয়। এলজিইডি'র সদর দপ্তর থেকে মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয় এই প্রাক্কলন প্রস্তুত করার জন্য রয়েছে নিজস্ব একটি সফটওয়্যার, যার নাম রেট শিডিউল এন্ড এস্টিমেট প্রিপারেশন সিস্টেম। সিস্টেমটি ব্যবহার-বান্ধব এবং নির্ভুল ফলাফল দেয়ায় এটি এলজিইডি'র জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারে এলজিইডি সম্মুখসারির প্রতিষ্ঠান হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে। ২০১১ সালে দেশে ইলেকট্রনিক সরকারি ক্রয় (ই-জিপি) শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলজিইডি এই পদ্ধতি ব্যবহার শুরু করে।

বর্তমানে এলজিইডি প্রায় শতভাগ ক্রয় ই-জিপির মাধ্যমে সম্পাদন করছে। এছাড়া ই-জিপি পদ্ধতিতে ক্রয় সম্পাদনের জন্য নিজস্ব ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনবল এবং ঠিকাদারদের প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে এলজিইডি সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এর সহায়তায় দেশের ২২ জেলায় ই-জিপি প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন করেছে এবং দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে আসছে। দাপ্তরিক কার্যক্রমকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে এলজিইডি ই-নথি ব্যবহার শুরু করেছে। বর্তমানে সদর দপ্তরের প্রায় সকল ইউনিট ও প্রকল্প ই-নথির মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তি করছে। বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এলজিইডির প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

# কাজের স্বীকৃতি

দেশব্যাপী পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টরে অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা, প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সুরক্ষা এবং স্থানীয় পর্যায়ে ইতিবাচক পরিবর্তনে এলজিইডি কার্যকরী কর্মসূচি গ্রহণ করে বিভিন্ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন করেছে। সারাবিশ্বের বৃহৎ সব উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আস্থা অর্জনে সফল এই প্রতিষ্ঠান প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের রোলমডেল হিসেবে বিবেচিত। এলজিইডি গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্প এখন অনেক দেশে অনুসরণ করা হয়। কাজের সফলতায় অনেক আগেই ঘটেছে এলজিইডির স্বীকৃতি অর্জন, পুরস্কার প্রাপ্তি, যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

## এশিয়  উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি)

বাংলাদেশ এশিয়  উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ‘সেরা প্রকল্প দল’ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছিলো ২০০১ সালে। বর্তমানে যা এডিবি’র নিয়মিত বার্ষিক অনুশীলনে পরিণত হয়েছে।

এডিবি সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে এলজিইডি মোট ০৭ বার ‘বেস্ট পারফরম্যান্স এ্যাওয়ার্ড’, ০৩ বার ‘বেস্ট প্রোজেক্ট টীম এ্যাওয়ার্ড’, ০৬ বার ‘এ্যানুয়াল পারফরম্যান্স রিকগনিশন এ্যাওয়ার্ড’, ০৩ বার ‘গুড প্রোজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ফোরাম এ্যাওয়ার্ড’ এবং ০১ বার ‘ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর লাইভেবল সিটি  এ্যাওয়ার্ড’ লাভ করেছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ এলজিইডির তিনটি প্রকল্প  ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এডিবির ‘গুড ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যাওয়ার্ড’অর্জন করে। প্রকল্পগুলি হচ্ছে তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩), চিটাগাং হিল ট্রাক্টস্ রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-২ এবং কোস্টাল ক্লাইমেট এনভায়রনমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (সিটিইআইপি)।

## ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ)

ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ) একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা যা উন্নয়নশীল দেশের গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষুধা নিবারণে গ্রামীণ অর্থনীতি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে। ইফাদ বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ অবকাঠামো বিশেষত কৃষি সেক্টরে বিনিয়োগ করে, যা বাংলাদেশের অত্যন্ত দরিদ্র মানুষ, তথা- ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক, ক্ষুদ্র উৎপাদনকারী, গ্রামীণ উদ্যোক্তা ও নারীরা উপকৃত হন। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে ইফাদ অর্থায়ন করছে এবং ২০০৩ থেকে এলজিইডি’র সাথে উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। ইফাদ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে এলজিইডি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পুরস্কার অর্জন করেছে।

২০১৩-২০১৪ সালে ‘সুনামগঞ্জ কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা’ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীদের ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এলজিইডি ‘জেন্ডার এওয়ার্ড’ অর্জন করেছে; ২৫ নভেম্বর ২০১৩ ইফাদের এসোসিয়েট ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব কেভিন ক্লিয়েভার আনুষ্ঠানিকভাবে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর কাছে এই স্বীকৃতি সনদ হস্তান্তর করেন।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘কোষ্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার’(সিসিআরআইপি) প্রকল্পটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এডিবি, ইফাদ, কেএফডব্লিউ এবং জিওবি অর্থায়নে জানুয়ারি ২০১৩ থেকে জুন ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের ইফাদ অঙ্গের কার্যক্রমের পারফরমেন্স মূল্যায়নে দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৫ সালে ‘আউটস্ট্যান্ডিং প্রোজেক্ট ইন বাংলাদেশ’ হিসেবে স্বীকৃতি পায়, ২০১৬ সালে ইফাদ এর কান্ট্রি প্রোগ্রাম অফিসার নিকোলাস সাঈদ এলজিইডিকে স্বীকৃতির সনদ হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে ২০১৯ সালে বিশ্বের ২৫৪টি প্রকল্পের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে  প্রকল্পটি বিশ্বের সেরা বাস্তবায়নকারী প্রকল্প হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বিগত ৩১ জুলাই ২০১৯ তারিখ ইফাদ এর এশিয় -প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক, মি. নাইজলে ব্রেট এলজিইডি সদর দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি সনদ হস্তান্তর করেন।

## শুদ্ধাচার পুরস্কার

২০১৯-২০ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসরণে দ্রুততার সঙ্গে সহজে জনসেবা প্রদানের স্বীকৃতি স্বরূপ দপ্তর/সংস্থা প্রধান ক্যাটাগরিতে এ পুরস্কার অর্জন করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান।

# ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা

রূপকল্প ২০২১- এর সাফল্যের ধারাবহিকতায় বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের আলোকে স্বপ্নের উন্নয়ন পথে জাতিকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যেই সরকার "রূপকল্প ২০৪১" গ্রহণ করেছে। এই রূপকল্পের প্রধান অভীষ্ট হলো ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান ও উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদায় উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের দ্রুত অবলুপ্তিসহ উচ্চ-আয় সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদায় আসীন হওয়া। বর্তমান সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২৫), টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), রূপকল্প- ২০৪১, ও বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রভৃতি বাস্তবায়নে এলজিইডি বাংলাদেশের পল্লি  উন্নয়ন, নগর উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে একক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে চলেছে।

### পল্লি উন্নয়ন সেক্টর

বিগত এক যুগে বাংলাদেশ অগ্রগতির সকল সূচকে অভূতপূর্ব সাফল্যের পেছনে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছে দেশব্যাপী গড়ে ওঠা শক্তিশালী পল্লি অবকাঠামো, যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল পল্লি সড়ক। পল্লি সড়ককে কেন্দ্র করে পল্লি অর্থনীতির সঞ্চালন এবং পল্লি জনজীবনের অনেক সুযোগ-সুবিধা ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়।

পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন সেক্টরে এলজিইডির ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

- ✓ জলবায়ু সহিষ্ণু সড়ক নির্মাণ,
- ✓ উন্নত বাজার অবকাঠামো,
- ✓ উপজেলা মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন,
- ✓ কমিউনিটি স্পেস এবং বিনোদনের ব্যবস্থা সম্বলিত অবকাঠামো নির্মাণ,
- ✓ গ্রাম পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা,
- ✓ উপজেলার প্রধান কার্যালয়ের সাথে সকল গ্রামের সংযোগ স্থাপন,
- ✓ ন্যূনতম দুই লেন বিশিষ্ট উপজেলা সড়ক উন্নয়ন,
- ✓ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার (ইপিজেড, পর্যটন রিসোর্ট, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র) সঙ্গে সংযোগ স্থাপন,
- ✓ গ্রামীণ বিনিয়োগ বিস্তারের জন্য সড়ক সংযোগশীলতার প্রসার,

### নগর উন্নয়ন সেক্টর

আধুনিক ও মানসম্মত নাগরিক সেবা সকলের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এলজিইডি নগর অবকাঠামো উন্নয়ন সেক্টরে নিম্নলিখিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে-

- ✓ পৌরসভার রাস্তা-ঘাট, বাস/ট্রাক টার্মিনাল সহ অন্যান্য পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও মানসম্পন্ন রক্ষণাবেক্ষণ,
- ✓ সকল পৌরসভায় কঠিন বর্জ ব্যবস্থাপনা (ফিক্যাল স্লাজ সহ) প্রবর্তন,
- ✓ পৌরসভার পরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থার (আউটফল খাল খননসহ) উত্থান,
- ✓ সকল পৌরসভার সৌন্দর্যবর্ধন ও চিত্তবিনোদন (পার্ক, অডিটোরিয়াম ইত্যাদি) অবকাঠামো নির্মাণ,
- ✓ রাজস্ব আদায় ও হিসাব সংক্রান্ত ওয়েব বেজড সফটওয়্যার – http:\\pauroservices.lged.gov.bd (ছয়টি মডিউল) পর্যায়ক্রমে দেশের সকল পৌরসভায় চালু করা,
- ✓ পৌরসভার ওয়েব বেজড রোড ইনভেন্টরি সফটওয়্যার প্রস্তুত ও কার্যকর করা,
- ✓ বাংলাদেশের সকল পৌরসভার নাগরিক সেবাসমূহের ডিজিটাইজেসন এবং অটোমেশন,
- ✓ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, এর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সফটওয়্যার প্রস্তুত ও সকল পৌরসভায় কার্যকর করা,
- ✓ পৌরসভার জিআইএস বেজড এ্যাসেট ইনভেন্টরি (রোড আইডিসহ) সফটওয়্যার প্রস্তুত, তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার,
- ✓ পৌরসভা পর্যায়ের কারিগরী দক্ষতা (তথ্য প্রযুক্তি সহ) বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

## ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সেক্টর

এলজিইডি ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে কৃষি কাজে স্বল্প পরিসরে সেচসুবিধা প্রদানে সহায়তা করলেও ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর থেকে তা প্রকল্প আকারে বাস্তবায়ন শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত তা অব্যাহত রেখেছে। ভবিষ্যতেও এ কার্যক্রম অব্যাহত রেখে দেশের খাদ্য, তথা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি ও বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর ভিত্তিতে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম-

- ✓ ফসল উৎপাদনে সেচ কার্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার বৃদ্ধিসহ দক্ষতা বৃদ্ধি;
- ✓ টেকসই সেচের জন্য ভূ-উপরিস্থ পানির অংশগ্রহণমূলক ও সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- ✓ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন কৌশল গ্রহণ;
- ✓ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা জোরদার করা;
- ✓ কর্মসংস্থান/আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- ✓ সেচ এলাকা বৃদ্ধি;
- ✓ বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সংস্কার;
- ✓ পানি নিষ্কাশন খাল খনন/পুনর্খনন/সংস্কার;
- ✓ সেচ ড্রেন/নালা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সংস্কার;
- ✓ পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো/হাইড্রোলিক কাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সংস্কার;
- ✓ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা ও নিবন্ধন

BDP 2100
BANGLADESH DELTA PLAN 2100
FORMULATION PROJECT